বাংলাদেশ নির্বাচন কমিশন

নির্বাচন কমিশন সচিবালয়

জনসংযোগ শাখা

পেপার ক্লিপিং- ০৫ মার্চ ২০১৮

প্রথম আলো

০৫ মার্চ ২০১৮

ইসির উদ্ভট প্রস্তাব

ফেসবুক বন্ধ না করে আসল কাজ করুন

নির্বাচন কমিশনের আইন ও বিধিমালা সংস্কার কমিটি জাতীয় সংসদ নির্বাচনে ফেসবুকের মতো সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে নির্বাচনী প্রচার বন্ধ করার সুপারিশ করেছে বলে গণমাধ্যমে খবর এসেছে। সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে প্রচারের নামে অপপ্রচার, ঘৃণা প্রচার, প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থী ও দল সম্পর্কে অশোভন ও মানহানিকর বক্তব্য আসার আশঙ্কা থেকে তারা এই সুপারিশ করেছে বলে জানানো হয়। এটি মাথাব্যথার কারণে মাথা কেটে ফেলার শামিল। প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থী বা দল সম্পর্কে মানহানিকর প্রচার চালালে তার বিরুদ্ধে আইনি ব্যবস্থা নেওয়ার সুযোগ আছে। আর এ ধরনের প্রচার তো শুধু সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে হচ্ছে না। রাজনীতির মাঠে হরহামেশাই হচ্ছে। সেসব বিষয়ে নীরব থেকে নির্বাচন কমিশন ফেসবুক নিয়ে টানাটানি করলে এর উদ্দেশ্য সম্পর্কে জনমনে সন্দেহ জাগা স্বাভাবিক।

এ ছাড়া কোনো বিধান জারি করলেই তো হবে না। সেটি বাস্তবসম্মত কি না, যাচাই করে দেখতে হবে। একজন সাবেক নির্বাচন কমিশনারও বলেছেন, এ ধরনের বিধান করলে তা কার্যকর করা অসম্ভব হবে। কারণ ফেসবুক, টুইটার এগুলো এখন জনপ্রিয় যোগাযোগমাধ্যম। বিপুলসংখ্যক মানুষ ইন্টারনেটে এসব যোগাযোগমাধ্যম ব্যবহার করবে। এগুলো বন্ধ করলে নির্বাচনের পরিবেশ সুস্থ হবে না।

ইসিকে মনে রাখতে হবে, কঠিন বাস্তবতায় আগামী নির্বাচন অনুষ্ঠিত হতে যাচ্ছে। তাদের সামনে বড় চ্যালেঞ্জ হলো সেই নির্বাচনের পরিবেশ তৈরি করা তথা সবার জন্য মাঠ সমতল করা। রাষ্ট্রীয় সুবিধা ব্যবহার করে কোনো দল নির্বাচনী প্রচার চালাবে, আর অন্যদের সভা-সমাবেশ করার গণতান্ত্রিক অধিকার থেকে বঞ্চিত রাখা হবে, সেটি হতে পারে না। তফসিলের দোহাই দিয়ে ইসি এ ব্যাপারে নিশ্চুপ থাকতে পারে না।

দলীয় সরকারের অধীনে নির্বাচন হলে তফসিল ঘোষণার পর তাদের প্রধান চ্যালেঞ্জ হবে জনপ্রশাসন ও আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর সদস্যদের নিজের নিয়ন্ত্রণে আনা। ইতিমধ্যে মাঠপর্যায়ের প্রশাসনে রদবদল শুরু হয়ে গেছে। ভবিষ্যতে আরও হবে। সেই রদবদলের প্রতিও ইসির কঠোর নজরদারি থাকতে হবে। তবে ইলেকট্রনিক ডিসপ্লে সম্পর্কে ইসির সংস্কার কমিটি যে প্রস্তাব করেছে, তা গ্রহণযোগ্য বলে ধারণা করি। সে জন্য আলাদা বিধি বা আইন করার প্রয়োজন নেই। বর্তমান আইনেই নির্বাচনী প্রচারের ওপর যে বিধিনিষেধ আছে, তার যথাযথ প্রয়োগ করলেই কোনো প্রার্থী লাখ লাখ টাকা খরচ করে এ ধরনের প্রচার চালাতে পারবেন না।

নির্বাচন কমিশনের কাছে আহ্বান থাকবে, ফেসবুক বন্ধের অবাস্তব চিন্তা বাদ দিয়ে তারা যেন নির্বাচনের অনুকূল পরিবেশ তৈরি করতে সর্বশক্তি নিয়োগ করে। ইসিকেও শুধু কথা নয়, কাজ দিয়েই প্রমাণ করতে হবে তারা স্বাধীন ও নিরপেক্ষ।

যুগান্তর
সত্যের সন্ধানে নির্ভীক THE DAILY JUGANTOR

সর্বাত্মক ভোটের প্রস্তুতি জাতীয় পার্টির

সোহরাওয়ার্দী উদ্যানে ২৪ মার্চ মহাসমাবেশের জোর প্রস্তুতি, ভোটের রোডম্যাপসহ গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত আসতে পারে মানুষের ঢল নামাতে চান এরশাদ, ৩০০ আসনে প্রার্থী দেয়ার চিন্তা

শেখ মামুনূর রশীদ

একাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন সামনে রেখে সর্বাত্মক প্রস্তুতি শুরু করেছে সাবেক রাষ্ট্রপতি হুসেইন মুহম্মদ এরশাদের নেতৃত্বাধীন জাতীয় পার্টি। ভোটের রাজনীতিতে দলের অবস্থান আরও সুদৃঢ় করতে বেশ আটঘাট বেঁধে মাঠে নেমেছে দলটি। এরই অংশ হিসেবে ২৪ মার্চ ঢাকার ঐতিহাসিক সোহরাওয়ার্দী উদ্যানে মহাসমাবেশ করতে যাচ্ছে জাতীয় পার্টি। অতীতের যে কোনো সময়ের চেয়ে এবারের মহাসমাবেশ অনেক বেশি গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে করছেন জাতীয় পার্টির নীতিনির্ধারকরা। তাদের মতে, নির্বাচনের বছরে এই মহাসমাবেশের মধ্য দিয়ে জাতীয় পার্টির শক্তি প্রদর্শনই নয়, আরও বেশ কিছু কারণে এটি গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠবে। মহাসমাবেশ থেকে এককভাবে নির্বাচনের নির্দেশনা, ৩০০ আসনে প্রার্থী দেয়া, এমনকি মন্ত্রিসভা থেকে বেরিয়ে আসার সুস্পস্ট ঘোষণা দিতে পারেন পার্টির চেয়ারম্যান হুসেইন মুহম্মদ এরশাদ। মহাসমাবেশ থেকে নির্বাচনী রোডম্যাপও ঘোষণা করবেন তিনি। নির্বাচনে জয়ী হয়ে সরকার গঠন করতে পারলে জাতীয় পার্টি কী করবে- এই রোডম্যাপে সে ঘোষণাও থাকবে।

জাতীয় পার্টির চেয়ারম্যান সাবেক রাষ্ট্রপতি হুসেইন মুহম্মদ এরশাদ রোববার যুগান্তরকে বলেন, ‘নানা কারণেই আমাদের এবারের মহাসমাবেশ অনেক বেশি গুরুত্বপূর্ণ। এটি নির্বাচনের বছর, এ মহাসমাবেশের মধ্য দিয়ে আগামী নির্বাচনের রোডম্যাপ ঘোষণা করা হবে। জাতীয় পার্টির ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা দেশবাসীর সামনে তুলে ধরা হবে।’ তিনি আরও বলেন, জাতীয় পার্টিকে ঘিরে দেশের মানুষের মনে নতুন করে যে আশার সঞ্চার হয়েছে, এ মহাসমাবেশে তা আরও একবার প্রমাণিত হবে। জাতীয় পার্টির নীতিনির্ধারকদের মতে, নব্বইয়ের পর এবারই সবচেয়ে বেশি সুসময় অপেক্ষা করছে জাতীয় পার্টির সামনে। ২০১৪ সালের ৫ জানুয়ারি নির্বাচনে অংশগ্রহণ করা না-করা নিয়ে দলটির মধ্যে দ্বিধা-দ্বন্দ্ব কাজ করলেও এবার আর সেই দ্বিধা-দ্বন্দ্ব নেই। কে অংশ নিলো, আর কে নিলো না- এ চিন্তা মাথায় না নিয়ে আগামী নির্বাচনে সর্বশক্তি দিয়ে লড়াইয়ের কথা ভাবছে জাতীয় পার্টি। সে অনুযায়ী দল গোছানো, প্রার্থী ঠিক করা, কেন্দ্র থেকে তৃণমূল পর্যায়ে নবীণ-প্রবীণের সমন্বয়ে পার্টিকে শক্তিশালী করাসহ নানা উদ্যোগ চলছে। তৃণমূলে পার্টি এবং প্রার্থীর অবস্থান জানার জন্য এবারই প্রথম মাঠপর্যায়ে জরিপ চালিয়েছে জাতীয় পার্টি।

সূত্র জানায়, ভোটের মাঠে সফল হতে দলটি একাধিক পরিকল্পনা হাতে নিয়ে এগোচ্ছে। আপাতত এককভাবেই নির্বাচনে অংশগ্রহণ এবং ৩০০ আসনেই প্রার্থী দেয়া অন্যতম। এ ইস্যুতে আটঘাট বেঁধেই মাঠে নেমেছে তারা। আওয়ামী লীগ নেতৃত্বাধীন ১৪ দল ও বিএনপি নেতৃত্বাধীন ২০ দলীয় জোটের বাইরে নিজেদের জোটকে নিয়েই ভোটে অংশ নেয়ার পরিকল্পনা সাজাচ্ছে তারা। এরই মধ্যে সিলেটে হযরত শাহজালাল (রহ.) এবং শাহ পরানের (রহ.)

মাজার জিয়ারতের মধ্য দিয়ে নির্বাচনী প্রচার শুরু করেছেন এরশাদ। আগামী নির্বাচনে তিনি রংপুর-১ ও ঢাকা-১৭ আসনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করবেন বলে জানা গেছে।

একই সঙ্গে ভোটের প্রস্তুতি হিসেবে আগে দলের সাংগঠনিক কাঠামো শক্তিশালী করার কাজে মনোনিবেশ করতে নেতাকর্মীদের নির্দেশ দিয়েছেন তিনি। সম্প্রতি দলের এক সভায় সাবেক রাষ্ট্রপতি এরশাদ বলেন, 'আগামী দিনে আমরা এককভাবে নির্বাচনে যাব। আর কারও সঙ্গে জোট নয়। তবে কেউ চাইলে আমাদের সঙ্গে আসতে পারে। এজন্য আগে পার্টিকে শক্তিশালী করতে হবে। তাহলেই মানুষ আমাদের দিকে এগিয়ে আসবে।' খোঁজ নিয়ে জানা গেছে, নির্বাচনের প্রস্তুতি সংক্রান্ত যাবতীয় বিষয় এরশাদ নিজেই তত্ত্বাবধান করছেন। এক্ষেত্রে তাকে সহায়তা করছেন পার্টির মহাসচিব এবিএম রুহুল আমিন হাওলাদার। এরই মধ্যে দলের এমপিদের যার যার নির্বাচনী এলাকায় আরও বেশি সময় দেয়ার জন্য বলেছেন জাতীয় পার্টির চেয়ারম্যান। সংসদ সদস্যদের বাইরে দলের শীর্ষ নেতা এবং সম্ভাব্য প্রার্থীদেরও এলাকায় যাতায়াত বাড়াতেও বলেছেন তিনি। নির্বাচনকে সামনে রেখে এরই মধ্যে দল মনোনীত সম্ভাব্য প্রার্থীদের একটি খসড়া তৈরির কাজে হাত দিয়েছেন এরশাদ। আগামী মাসে কাজটি সম্পন্ন করতে চান তিনি। এজন্য একটি রোডম্যাপও তৈরি করেছেন। এর অংশ হিসেবে দলের নেতারা কে কোন আসন থেকে নির্বাচন করতে চান, তা জানতে চেয়েছেন এরশাদ। নির্বাচনী এলাকায় জাতীয় পার্টির সাংগঠনিক অবস্থা জানানোর জন্য আগ্রহী প্রার্থীদের নির্দেশ দিয়েছেন তিনি।

জাতীয় পার্টির মহাসচিব এবিএম রুহুল আমিন হাওলাদার এমপি যুগান্তরকে বলেন, 'আমাদের সামনে এখন একটাই লক্ষ্য- তা হচ্ছে আগামী জাতীয় সংসদ নির্বাচনে ভালো ফল অর্জনের মাধ্যমে জাতীয় পার্টিকে ক্ষমতায় নেয়া। যেহেতু নির্বাচনের আর বেশি দেরি নেই, দেখতে দেখতে সময় ঘনিয়ে এসেছে, তাই আমরা নির্বাচনের সর্বাÍক প্রস্তুতি শুরু করেছি।' তিনি বলেন, 'এ প্রস্তুতির অংশ হিসেবেই ২৪ মার্চ ঢাকায় মহাসমাবেশ করতে যাচ্ছি। এটি হবে স্মরণকালের বৃহত্তম সমাবেশ। প্রায় পাঁচ লাখ লোক এতে সমবেত হবে। কেবল পার্টির শক্তি এবং সামর্থ্য জানান দিতেই নয়, আরও বেশ কিছু কারণে গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠবে এই মহাসমাবেশ।'

জাতীয় পার্টির নীতিনির্ধারকরা বলছেন, ভোটের রাজনীতিতে জাতীয় পার্টির গুরুত্ব বাড়াতে সম্প্রতি ৫৮ দলীয় জোট গঠন করেছেন হুসেইন মুহম্মদ এরশাদ। হেফাজতে ইসলামের সমর্থন আদায়েও দলটি কাজ করছে। সমর্থন পেলে ভোটের মাঠে প্রধান দুই দল আওয়ামী লীগ এবং বিএনপির জন্য বড় ফ্যাক্টর হয়ে উঠবে জাতীয় পার্টি। এ কারণেই ২৪ মার্চ মহাসমাবেশ সফলে সর্বাত্মক প্রস্তুতি নিয়েছে দলটি। নির্বাচন সামনে রেখে নিজেদের সামর্থ্যরে প্রমাণ দিতে বড় শোডাউন করতে চায় বিরোধী দল।

খোঁজ নিয়ে জানা গেছে, স্মরণকালের সবচেয়ে জাঁকজমকপূর্ণ এ মহাসমাবেশ হবে দলের জন্য বড় শোডাউন। দলের ৩২তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী উপলক্ষে এ মহাসমাবেশ। কর্মসূচি সফল করতে পার্টির মহাসচিব এবিএম রুহুল আমিন হাওলাদারের নেতৃত্বে পার্টির কেন্দ্রীয় নেতারা ধারাবাহিকভাবে বিভাগীয় পর্যায়ে প্রস্তুতি সভা করছেন। এছাড়া জেলা-উপজেলায়ও কেন্দ্রীয় একাধিক টিম গিয়ে প্রস্তুতি সভা করছে। রোববার রংপুরে এরশাদের উপস্থিতিতে প্রস্তুতি সভা হয়েছে। সভায় রংপুর বিভাগের নেতারা এরশাদকে আশ্বস্ত করেছেন যে মহাসমাবেশে বৃহত্তর রংপুর বিভাগের জেলা-উপজেলা থেকে লক্ষাধিক নেতকর্মী অংশ নেবেন। সভায় এরশাদের সঙ্গে পার্টির কো-চেয়ারম্যান জিএম কাদের, মহাসচিব এবিএম রুহুল আমিন হাওলাদার এমপি, জিয়াউদ্দিন আহমেদ বাবলু এমপি, মশিউর রহমান রাঙ্গা এমপি ও রংপুর সিটির মেয়র মোস্তফিজুর রহমান মোস্তফা উপস্থিত ছিলেন।

এদিকে গত সপ্তাহে বরিশালে বিভাগীয় সভা করেছে জাতীয় পার্টি। সভায় পার্টির মহাসচিব এবিএম রুহুল আমিন হাওলাদার ছাড়াও অংশ নেন ব্যারিস্টার আনিসুল ইসলাম মাহমুদ, সৈয়দ আবু হোসেন বাবলা এমপি, কাজী ফিরোজ রশীদ এমপি, জিয়াউদ্দিন আহমেদ বাবলু এমপি। এর আগে খুলনায় বিভাগীয় সভা হয়েছে। ১০ মার্চ

চট্টগ্রামে বিভাগীয় সভা হবে। সভায় অংশ নেবেন পার্টির মহাসচিব রুহুল আমিন হাওলাদার, কাজী ফিরোজ রশীদ, সৈয়দ আবু হোসেন বাবলাসহ দলের এক ডজন কেন্দ্রীয় নেতা। সভা আয়োজন করছেন ব্যারিস্টার আনিসুল ইসলাম মাহমুদ, জিয়াউদ্দিন আহমেদ বাবলু ও সোলেমান আলম শেঠ। এর আগে ৯ মার্চ কুমিল্লা ও ফেনীতেও প্রস্তুতি সভা হবে। পরে মহাসচিবের নেতৃত্বে সিলেটে বিভাগীয় সভা হবে মহাসমাবেশ সফল করতে। এছাড়াও মহাসমাবেশে ঢাকায় জনতার ঢল নামাতে মরিয়া জাতীয় পার্টির ঢাকা জেলা, দোহার-নবাবগঞ্জ, ঢাকা মহানগর উত্তর ও দক্ষিণসহ দলের অঙ্গ এবং সহযোগী সংগঠনগুলো। এরই মধ্যে ঢাকা মহানগর উত্তর ও দক্ষিণ জাতীয় পার্টির পক্ষ থেকে ব্যাপক প্রস্তুতি নেয়া হয়েছে। ঢাকা মহানগর দক্ষিণ জাতীয় পার্টির পক্ষ থেকে অর্ধলক্ষাধিক নেতাকর্মী সমাবেশে অংশ নেবেন বলে জানিয়েছেন ঢাকা মহানগর দক্ষিণ জাতীয় পার্টির সভাপতি সৈয়দ আবু হোসেন বাবলা এমপি। ঢাকা মহানগর উত্তরের পক্ষ থেকেও নেয়া হয়েছে ব্যাপক প্রস্তুতি। থানা ও ওয়ার্ডে ওয়ার্ডে চলছে প্রস্তুতি সভা। জাতীয় পার্টির নেতাদের মতে, একাদশ জাতীয় নির্বাচনের আগে অন্যান্য রাজনৈতিক দল, দেশের মানুষ ও বিদেশি বন্ধুদের কাছে নিজের শক্তি জানান দিতে এই মহাসমাবেশে জনতার ঢল নামতে চান এরশাদ। এজন্য তিনি দলের সব স্তরের কেন্দ্রীয় নেতাদের নির্দেশনা দিয়েছেন সর্বশক্তি নিয়োগ করে সমাবেশ সফল করতে। দলের বর্তমান এমপিদের পাশাপাশি আগামী নির্বাচনে যারা দলের মনোনয়নপ্রত্যাশী, তাদের সবাইকেই নিজ নিজ নির্বাচনী আসন থেকে কমপক্ষে তিন হাজার নেতাকর্মী-সমর্থক নিয়ে মহাসমাবেশে উপস্থিতি নিশ্চিত করার নির্দেশনা দিয়েছেন এরশাদ।

আমরা জনগণের পক্ষে
বাংলাদেশ প্রতিদিন

কী হবে ঢাকা সিটি ভোটের

দ্রুত জটিলতা নিরসনের আশা আইনজীবীদের

গোলাম রাব্বানী ও আরাফাত মুন্না

ঢাকা উত্তর সিটি করপোরেশনের মেয়র পদে উপনির্বাচন ও দুই (উত্তর ও দক্ষিণ) সিটির নতুন ৩৬ ওয়ার্ডের ভোটের কী হবে, তা নিয়ে নগরজুড়েই চলছে আলাপ-আলোচনা। ভোটাররা বলেছেন, উত্তর সিটিতে নির্বাচিত মেয়র না থাকায় সেবা পাওয়া যাচ্ছে না। পদে পদে ভোগান্তি পোহাতে হচ্ছে। প্রার্থীরাও ভোট নিয়ে অনিশ্চয়তার কথা জানিয়েছেন।

নির্বাচন বিশ্লেষকরা বলছেন, আগামী জাতীয় সংসদ নির্বাচনের আগে ঢাকার দুই সিটি করপোরেশন ভোট হবে কি না তা নিয়ে সন্দেহ রয়েছে। তারা বলছেন, সামনে পাঁচ সিটি করপোরেশনের নির্বাচন রয়েছে। এ ছাড়া আগামী ৩০ অক্টোবর থেকে জাতীয় সংসদ নির্বাচনের ‘কাউন্টডাউন’ শুরু হবে। তার আগে প্রস্তুতিমূলক কার্যক্রম হাতে নিতে হবে ইসিকে। এক্ষেত্রে আইনি জটিলতা সমাধান হলেও ইসি ঢাকায় ভোট করতে পারবে বলে মনে হয় না। নির্বাচন কমিশন বলছে, আমরা আইনি লড়াই চালিয়ে যাচ্ছি। আশা করছি, জটিলতা সমাধান হলে ভোট করতে পারব। নির্বাচন কমিশন কর্মকর্তারা বলছেন, ঢাকা উত্তর সিটি করপোরেশনের মেয়র পদে উপনির্বাচন এবং দুই সিটিতে নতুন যুক্ত হওয়া ওয়ার্ডে কাউন্সিলর নির্বাচনের ভোট গ্রহণ আটকে আছে উচ্চ আদালতে। ভোটার তালিকা সংক্রান্ত জটিলতা নিয়ে পৃথক তিনটি রিট আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে হাই কোর্টে স্থগিত হয়ে আছে এই নির্বাচন। এই আবেদনগুলোতে জারি করা রুল দ্রুত নিষ্পত্তিতে আপিল বিভাগ আদেশ দিলেও এখনো হাই কোর্টে শুনানি শুরু হয়নি। সংশ্লিষ্টরা জানিয়েছেন, শিগগিরই এই রুল নিষ্পত্তি হয়ে নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে। এই তিন রুল নিষ্পত্তিতে

বিচারপতি গোবিন্দ চন্দ্র ঠাকুর ও বিচারপতি এ কে এম সাহিদুল হকের সমন্বয়ে গঠিত হাই কোর্ট বেঞ্চকে দায়িত্ব দিয়েছে সুপ্রিম কোর্টের আপিল বিভাগ।

এ বিষয়ে বিচারপতি গোবিন্দ চন্দ্র ঠাকুর নেতৃত্বাধীন হাই কোর্ট বেঞ্চের ডেপুটি অ্যাটর্নি জেনারেল এ এস এম নাজমুল হক বাংলাদেশ প্রতিদিনকে বলেন, আপিল বিভাগ থেকে আদেশ হলেও এখনো আমাদের কোর্টে এ বিষয়ে কোনো কাগজপত্র আসেনি। আমার জানামতে কেউ বিষয়টি শুনানির জন্য উপস্থাপন করেনি। রুলগুলো শুনানির জন্য কার্যতালিকায়ও আসেনি বলে জানান এই আইন কর্মকর্তা। এ বিষয়ে উত্তর সিটি করপোরেশনের বিএনপি মনোনীত মেয়র প্রার্থী তাবিথ আউয়ালের আইনজীবী ব্যারিস্টার এ কে এম এহসানুর রহমান বাংলাদেশ প্রতিদিনকে বলেন, এই মামলাটি মূলত নির্বাচন কমিশনের। তারাই এ বিষয়ে চূড়ান্ত শুনানি করবে। তবে আমরা বিএনপি মনোনীত প্রার্থী তাবিথ আউয়ালের পক্ষে এখানে পক্ষভুক্ত হয়েছি। তিনি বলেন, যে ভিত্তিগুলোর ওপর নির্ভর করে মেয়র পদে নির্বাচন স্থগিত করা হয়েছে, তার কোনো যুক্তিকতা নেই। আমরা চাই নির্বাচন অতিদ্রুত সম্পন্ন হোক। আমরা আদালতে এসব বক্তব্যই তুলে ধরব। নির্বাচন কমিশনের আইনজীবী বিষয়টি দ্রুত শুনানির উদ্যোগ নেবেন বলেও আশা করেন তিনি। এর আগে গত ২৫ ফেব্রুয়ারি ঢাকা উত্তর সিটি করপোরেশনের মেয়র পদে উপনির্বাচন এবং দুই সিটিতে (উত্তর ও দক্ষিণ) নতুন যুক্ত হওয়া ওয়ার্ডে কাউন্সিলর নির্বাচনের বিষয়ে দেওয়া পৃথক তিনটি রুল দ্রুত নিষ্পত্তির নির্দেশ দিয়েছে সুপ্রিম কোর্টের আপিল বিভাগ। নির্বাচন কমিশনের পৃথক তিনটি লিভ টু আপিল আবেদনের নিষ্পত্তি করে ওইদিন প্রধান বিচারপতি সৈয়দ মাহমুদ হোসেনের নেতৃত্বাধীন চার বিচারপতির আপিল বেঞ্চ এ আদেশ দেয়। ফলে রুল নিষ্পত্তি হওয়ার আগ পর্যন্ত দুই সিটির নির্বাচন স্থগিতই থাকল বলে জানিয়েছেন সংশ্লিষ্ট আইনজীবীরা। উত্তর ও দক্ষিণের নির্বাচন নিয়ে হাই কোর্টের দুটি বেঞ্চে দেওয়া পৃথক রুল নিষ্পত্তির জন্য বিচারপতি গোবিন্দ চন্দ্র ঠাকুর ও বিচারপতি এ কে এম সাহিদুল হকের সমন্বয়ে গঠিত হাই কোর্ট বেঞ্চকে দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে আপিল বিভাগের আদেশে। গত ১৬ জানুয়ারি রাজধানীর ভাটারা ও বেরাইদ ইউনিয়ন পরিষদের দুই চেয়ারম্যান ডিএনসিসি মেয়র পদে উপনির্বাচন ও নতুন যুক্ত হওয়া ওয়ার্ডে কাউন্সিলর নির্বাচন স্থগিত চেয়ে হাই কোর্টের সংশ্লিষ্ট শাখায় পৃথক দুটি রিট দায়ের করেন। পরদিন দুটি রিটের শুনানি নিয়ে পৃথক রুল জারির পাশাপাশি নির্বাচন সংক্রান্ত তফসিলের কার্যকারিতায় ছয় মাসের জন্য স্থগিত করে হাই কোর্ট। রুলে নির্বাচনের বিষয়ে ৯ জানুয়ারি ইসির জারি করা তফসিল কেন অবৈধ ঘোষণা করা হবে না, তাও জানতে চাওয়া হয়। এ ছাড়াও দক্ষিণ সিটি করপোরেশেনে (ডিএসসিসি) নতুন যুক্ত হওয়া ১৮ ওয়ার্ডের কাউন্সিলর নির্বাচন স্থগিতের বিষয়ে পৃথক রিট করেন স্থানীয় কয়েকজন বাসিন্দা। ওই রিটে ১৮ জানুয়ারি ডিএসসিসি নির্বাচন চার মাসের জন্য স্থগিত করে হাই কোর্ট। পাশাপাশি নির্বাচনের বিষয়ে ৯ জানুয়ারি ইসির জারি করা তফসিল কেন অবৈধ ঘোষণা করা হবে না, তাও জানতে চাওয়া হয় রুলে। এরপর ১ ফেব্রুয়ারি দুই সিটি করপোরেশনের নির্বাচন স্থগিতের বিষয়ে হাই কোর্টের দেওয়া আদেশের বিরুদ্ধে লিভ টু আপিল দায়ের করে নির্বাচন কমিশন। এরই ধারাবাহিকতায় গত ২৫ ফেব্রুয়ারি পৃথক আবেদনের শুনানি নিয়ে আপিল বিভাগ আদেশ দেয়। ২০১৫ সালের ২৮ এপ্রিল ঢাকা উত্তরে ভোট হয়েছিল। প্রায় দুই বছর দায়িত্ব পালনের পরে গত বছরের জুলাইয়ে যুক্তরাজ্যে গিয়ে অসুস্থ হয়ে হাসপাতালে ভর্তি হন মেয়র আনিসুল হক। চিকিৎসাধীন অবস্থায় ৩০ নভেম্বর তার মৃত্যু হয়। স্থানীয় সরকার বিভাগ গত ১ ডিসেম্বর থেকে মেয়র পদটি শূন্য ঘোষণা করে। ফলে আইন অনুযায়ী ৯০ দিন তথা গত ২৮ ফেব্রুয়ারির মধ্যে এ উপনির্বাচন করার বাধ্যবাধকতা ছিল। সেই হিসাবে গত ৯ জানুয়ারি ঢাকা উত্তরের মেয়র পদে উপনির্বাচন ও দুই সিটিতে নতুন যুক্ত ৩৬ ওয়ার্ডের ভোটের তফসিল ঘোষণা করে নির্বাচন কমিশন। তফসিল অনুযায়ী, গত ২৬ ফেব্রুয়ারি উত্তর সিটির মেয়র পদসহ ঢাকার দুই সিটি করপোরেশনে নতুন যুক্ত হওয়া ১৮টি করে ৩৬টি সাধারণ ওয়ার্ড এবং ছয়টি করে ১২টি সংরক্ষিত ওয়ার্ডের ভোট হওয়ার কথা ছিল। এমনকি প্রধান দুই দল আওয়ামী লীগ ও বিএনপি তাদের প্রার্থী চূড়ান্ত করলেও আদালতের আদেশে ওই নির্বাচন আটকে আছে।

নির্বাচনে লড়বে আওয়ামী লীগ বনাম আওয়ামী লীগ -জাফর ওয়াজেদ

আত্মম্ভরিতা মানুষকে ঔদ্ধত্য আচরণের দিকে ধাবিত করে। আত্মতুষ্টি বা আত্মসন্তুষ্টি এক পর্যায়ে অবসান এনে দেয়। অবসিত মানবের পক্ষে তার অগ্রগতির ধারাবাহিকতা রক্ষা করা দুরূহ হয়ে পড়ে। তৃপ্তির ঢেঁকুর তোলে সাময়িক প্রশান্তি লাভ করা গেলেও দীর্ঘস্থায়ী শান্তির পথ প্রশস্ত করে না। শুধু খাদ্য বস্ত্র বাসস্থানের সংস্থান হয়ে গেলেই মানুষের সব পাওয়া হয় না। মানুষ যন্ত্র নয়। তার মন আছে। মনের খোরাক, চিন্তার ঔদার্যকে গলা টিপে রেখে খুব বেশিদিন মানুষকে যে শাসন করা যায় না, তা বোঝা উচিত শাসককুলের। কিন্তু তারা যে তা বুঝতে চায় না, বুঝার চেষ্টাও নেই, সে কথাটা পরিষ্কার হয়ে আসে তাদের আচরণেই। তারা তখন যুক্তি-তর্কের ধার ধারে না। তারা ভুলে যায়, এদেশের রাজনীতি, সংস্কৃতিতে তর্কের একটা যোগ্য স্থান ছিল। যা আর চর্চিত হয় না। কষ্টি পাথরে যাচাই করার প্রবণতাই হারিয়ে ফেলেছে, তর্ককে দূরে সরিয়ে রাখার কারণে। এক সান্দহিক বিশ্বাসে ভর করে গড্ডলিকা প্রবাহে নিয়ত প্রবহমান যেন তারা। তর্কের আবহ ফিরুক, যুক্তির চর্চা হোক- এমনটা আর একালের রাজনীতিতে গুরুত্ব পায় না। পরিবর্তনে রয়ে পেতে চায় অপরিবর্তনীয়। গুণগত কোন পরিবর্তন অবশ্য দৃশ্যমান নয়। 'মহাজ্ঞানী মহাজন যে পথে করেছে গমন' সে পথ ধরে যেতে আগ্রহী নয় বিন্দুমাত্রও। ফলে নানা হোঁচট খেয়ে খেয়ে পতনে-উত্থানে চিরজাগরুক থেকে যেতে চাইলেও বিধিকারত্বের ঘেরাটোপে আবদ্ধ থেকে যাচ্ছে সবকিছু। ফলে জনমতকে নিজের দিকে টেনে আনা আর সহজসাধ্য হচ্ছে না। চারদিকে নাগিনীরা দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলছে। সে বিশ্বাসে রয়েছে বিষ। সে বিষে আক্রান্ত হওয়ার সম্ভাবনা তীব্র থাকে। বিষাক্ত আবহাওয়া, বিষাক্ত পরিবেশের বিস্তারের এই কালে শান্তি, স্বস্তির দিগন্ত ধরে রাখাও কঠিন। আর কঠিন বলেই হয়তো সে পথ মাড়াতে চায় না। তাই বিষের বাঁশি বেজে ওঠে। সে সুরে থাকে ধ্বংসের বারতা। সৃষ্টির যতো জারিকুরি, যত বিবর্তনই হোক না কেন, সবই লোপ পেয়ে যাবে ক্রমশ নিজেদের কলহ আর বিবাদের ক্রমবর্ধমান তোপে। যতই গলা হাঁকিয়ে আত্মম্ভরী কণ্ঠে নিনাদিত হোক না কেন নিজস্ব শক্তিমত্তা, ততই তা ফসকে যাবার লক্ষণ ক্রমশ দৃশ্যমান। অপসৃয়মান হবার সম্ভাবনা দেখা যায় না কোনোভাবেই। লড়াইয়ের ময়দানে আত্মতৃপ্তি বিপর্যয় ডেকে আনতে পারে। পরাজয় এসে মাথা বাড়াতে পারে, বানাতে পারে দুর্বল। আর এই দুর্বলতা চিত্তজুড়ে শুধু নয়, কর্মজুড়েও প্রসারিত হয়ে যায়। সত্যও বাস্তবকে অস্বীকার করে কেবলই বায়বীয় চিন্তা-ভাবনাকে সামনে এনে তা সর্বত্র ছড়ানো হলো, ফল দাঁড়াবে বায়বীয়ই। বাস্তবতার ডিঙ্গি নৌকা মাঝ নদীতে নয়, কিনারেই ডুবে যেতে পারে। ডুবন্ত নৌকা থেকে লাফিয়ে তীরে উঠাও হয়ে ওঠে না সবার জন্য সহজতর। তাই স্বগত সলিলে সমাধি ঘটে যেতে পারে। রাজনীতির মারপ্যাঁচ বা রণকৌশল যদি বাস্তবতা বিবর্জিত হয়, তবে পরাজয় অনিবার্য। কিন্তু কেউ তো চায় না পরাজিত হতে। জোর করে আর যা-ই হোক ঠেকিয়ে রাখা যায় না পরাজয় ও তার গ্লানি। সাংগঠনিক শক্তি যদি থাকে দৃঢ়, তবে সংগঠনই পথ দেখাতে পারে, কোন দিকে বিজয়ের রথ বিজয় পতাকা তখনই তুলে দেয়া যায় হাতে হাতে। কিন্তু সে পতাকা বহিবার শক্তি যদি হয় ক্ষীয়মান, তবে দৃঢ়তায় সংঘবদ্ধ শক্তিও বিপর্যয়ের সামনে হয়ে পড়ে অসহায়। অসহায়ত্বের অনেক নিদর্শনই রয়ে গেছে অতীতে। জনমতের শীর্ষস্থানে বসবাস করেও জনমতের প্রতিফলন নাও মিলতে পারে। যদি তা-ই হয়, তবে আগামী দিনে স্বদেশের পরিণতি যে কোনদিকে যেতে পারে, তা আগাম বলে দেয়া যায়।

সামনে নির্বাচন আসছে। আর নয় মাস পরই নির্বাচন হবে এদেশে। ভোটের মাধ্যমে প্রতিফলিত হবে সেই জনমত, যার ছায়া-প্রচ্ছায়ায় বসবাস করে উত্তীর্ণ হবার সম্ভাবনাটুকু সবার জন্যই অবধারিত বলে আপাত মনে হবে। কিন্তু জয়লাভ তার পক্ষেই সম্ভব, যার দিকে তাকিয়ে আছে বৃহত্তর জনগোষ্ঠী। এই জনগণের কাছে নিজের অবস্থান তুলে ধরা না গেলে বজ্র আঁটুনি ফস্কা গেরোতে পরিণত হতে বাধ্য। জনগণ সেই মানুষকেই চাইবে, যার কাছে রয়েছে আশা-আকাঙ্ক্ষা পূরণের চাবিকাঠি। দৃশ্যমান উন্নয়নের চেয়েও ভারী তাদের কাছে সেই মানুষের কীর্তিকলাপ ও কার্যক্রম। যার ভিত্তিতে জনগণ সিদ্ধান্ত নেয়, নিতে পারে। জনমত অর্জন সহজ নয় সবার জন্য। রাজনৈতিক দল এবং দলের প্রতি মানুষ হুমড়ি খেয়ে পড়ে তখনই, যখন স্পষ্ট হয়, সেই দল মানব মুক্তির পথকে করবে ত্বরান্বিত। অতীতের ক্রিয়াকলাপ মাথায় রেখেই জনগণ সিদ্ধান্ত নিয়ে থাকে। তাই ১৯৭০ সালের সাধারণ নির্বাচনে বাঙালী ভোটাররা শেখ মুজিব, আওয়ামী লীগ ও নৌকা মার্কার প্রতি নির্দ্বিধায় ঝুঁকে পড়েছিল। মুক্তির সোপান অর্জনের লক্ষ্যে জনগণ নিঃসংশয়চিত্তে ভোট দিয়েছিল। স্বাধিকার ও স্বাধীনতা অর্জনের তীব্রতায় মানুষ ঐক্যবদ্ধ হয়েছিল শেখ মুজিবের বিজয় রথকে ঠেলে নিতে। জনগণ তাদের চাওয়া-পাওয়াকে খুঁজে পেয়েছিল আওয়ামী লীগের মধ্যে কিন্তু যে আওয়ামী লীগ আর আজকের আওয়ামী লীগ এক নয়। চরিত্রগত, গুণগত, আদর্শগত, চেতনাগত পার্থক্য বিশাল। নানা বাক, নানা বাধা-বিপত্তি পেরিয়ে দলটি আজ যেখানে দাঁড়িয়েছে, সেখানে রাজনৈতিক আদর্শ আর দর্শন দৃশ্যমান নয়। দল হিসেবে আওয়ামী লীগ পুরাতন নতুন কোন আদর্শকেই আর জনগণ দূরে থাক, দলীয় নেতা-কর্মীদের মধ্যে সম্প্রসারিত করতে পারছে না। দলীয় লোকজনের মনোভাব আর মানবতার মধ্যে গণমানুষের মুক্তির জন্য গৃহীত মতাদর্শগুলো একটিও নয়। ক্ষমতার সুবাতাস তাই বহে না; বরং বিষাবাষ্প এমনভাবেই সংক্রমিত হয়েছে যে, সাম্প্রদায়িক ও মৌলবাদী চিন্তা-চেতনাও মাথাচাড়া দিয়ে ওঠে মাঝে মধ্যে। অসাম্প্রদায়িক আদর্শকে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব যে উচ্চাসনে ঠাঁই দিয়েছিলেন, দলীয় নেতা-কর্মীদের কাছে তার গুরুত্ব তেমন প্রকাশিত নয়। দলে ঠাঁই পাওয়া নীতিহীন, আদর্শহীনরা এমনভাবে জেঁকে বসেছে যে, ধর্মনিরপেক্ষ চেতনাকে আর খুঁজে পাওয়া যায় না। দলের আদর্শ আর নীতি কারও মধ্যেই খুঁজে পাওয়া যায় না। বাঙালী জাতীয়তাবাদের যে চেতনা বঙ্গবন্ধু তার রাজনৈতিক জীবন ও কর্মকা-ের মাধ্যমে জনগণের মধ্যে সম্প্রসারিত করতে পেরেছিলেন, তার অস্তিত্ব খুঁজে পাওয়া দুষ্কর। সামরিকজান্তা শাসক জিয়া প্রবর্তিত পাকিস্তানী ভাবধারায় বাংলাদেশী জাতীয়তাবাদ আওয়ামী লীগ লালন করছে। ফলে বাঙালী আর বাংলাদেশী ভাবধারার মধ্যে এক ধরনের সংঘাত কাজ করছে। বাঙালী সংস্কৃতির ধারাবাহিকতায় বঙ্গবন্ধু উঁচুমানের যে সাংস্কৃতিক চেতনার বিস্তার ঘটিয়েছিলেন, তার কোন নিদর্শন আর মেলে না। গড্ডলিকা প্রবাহে আষ্টেপৃষ্ঠে নিজেকে বেঁধে নিয়ে আওয়ামী লীগ অপসংস্কৃতিকেই সংস্কৃতি মনে করে তার পৃষ্ঠপোষকতা প্রদান করে আসছে। ধর্মীয় চেতনার প্রসার ঘটিয়ে নিজেকে ধর্মপ্রাণ প্রমাণ করার জন্য অনেক ধর্মব্যবসায়ীকেও প্রশ্রয় দিয়ে যাচ্ছে। বঙ্গবন্ধুর সাহচর্যে এবং সময়ে যারা সম্পৃক্ত ছিলেন রাজনীতিতে তাদের মনোজগত যেভাবে গড়ে উঠেছিল, তার লেশটুকুও এখন আর মেলে না। সমাজবিরোধী শক্তিশালী দুর্বৃত্তকেও কাছে টেনে নিতে দ্বিধাগ্রস্ত নয় দলটি। লুটেরা, দুর্নীতিবাজ, তদ্বিরবাজদের ভিড় ভাট্টা এমনই বেড়েছে যে, দলের আদর্শ ও নীতি তাতে চাপা পড়ে গেছে। দলের বহুসংখ্যক নেতাকর্মী এই দুর্বৃত্তায়নকে মেনে না নিলে এই দুর্বৃত্ত চরিত্রের সৃষ্টি হতো না। দলের মধ্যে শেখ হাসিনা বাদে এমন কোন নেতা-কর্মী বিকশিত হয়ে উঠতে পারেননি, যাদের মধ্যে সমসাময়িক সমাজের প্রতিফলন পাওয়া যায়। দলের মধ্যে যুগপুরুষ দূরে যাক, সর্বজনগ্রহণযোগ্য নেতৃত্বেরও বিকাশ ঘটছে না। সমাজের বহু মানুষের অস্ফুট বক্তব্য পরিষ্কার করে তুলে ধরার দায়িত্ব রাজনৈতিক নেতৃত্বের ওপরই বর্তায়। আবার এদের কাজে সমাজের বিশেষ পরিবর্তনের ধারা জোর পায়। অথচ দলে সেই নেতৃত্বের খোঁজ আর পাওয়া যায় না। সামাজিক মানুষের জীবনে যিনি বড় আকারের ছাপ ফেলেন, ইতিহাসে সেই মানুষ অমর এমনটাই সর্বজনবিদিত। কিন্তু দলে সেই মানব আর নেই। ছোট আকারের দৃষ্টি ফেলার মতোও কেউ জন্মায় না আর। গণমানুষের নেতা আজ আর মেলে না। এক অদ্ভুত আঁধার এসে আজ গ্রাস করেছে আওয়ামী লীগ নামক প্রায় সত্তর-উর্ধ্ব রাজনৈতিক দলটিকে। সাম্প্রতিক সময়ে টানা নয় বছরের বেশি ক্ষমতায় আসীন হয়েও দলটি সংগঠিত হতে পারেনি। মাঝে মাঝে প্রশ্ন আসে মনে, আসলেই কি আওয়ামী লীগ নেতারা চাইছেন? দলটি একটি সুসংগঠিত দলে পরিণত হোক। আগাছা, পরগাছা মুক্ত হোক। জনগণের নেতা গড়ে উঠুক। জবাব পাওয়া অবশ্য দুষ্কর। বঙ্গবন্ধু স্বাধীনতার পর একমুখী শিক্ষা ব্যবস্থা চালুর পদক্ষেপ নিয়েছিলেন। আর

আজকের আওয়ামী লীগ বহুধারায় শিক্ষা ব্যবস্থা বহাল করেছে, যার ফলে অর্ধশিক্ষিত প্রজন্ম গড়ে উঠেছে। ধর্মীয় শিক্ষাকে এমনই প্রাধান্য দেয়া হচ্ছে যে, জঙ্গীবাদ, সন্ত্রাসবাদের বিস্তার ঘটছে শুধু নয়, এই শিক্ষার্থীদের অনেকেই বাংলাদেশের স্বাধীনতা, বাঙালীর ইতিহাস ও ঐতিহ্যের বিরোধী। পাকিস্তানী জান্তা শাসক ও তাদের এ দেশীয় দোসরদের মতো এরা বঙ্গবন্ধুর প্রতি বিষোদগার করে। স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী উৎফুল্লের সঙ্গে বলে উঠতে পারেন, মাদ্রাসা ছাত্ররা আগামী দিনের নেতৃত্ব দিবে। আরেক ধাপ এগিয়ে শিক্ষামন্ত্রী বলেছেন, মাদ্রাসা শিক্ষার বিস্তার ঘটাতে হবে। কিন্তু তিনি কখনই বলেন না মাদ্রাসা শিক্ষাকে আধুনিকায়নের মাধ্যমে সমাজ বাস্তবতার সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ করা হবে। ধর্মব্যবসায়ীরা আওয়ামী লীগে অনায়াসে আশ্রয় শুধু নয়, পদ-পদবিও পাচ্ছে। অনেক স্থানে তারাই দল ও জনগণের নিয়ন্ত্রকে পরিণত হয়েছে। ফলে বঙ্গবন্ধু এবং মুক্তিযুদ্ধের আদর্শ ও চেতনাধারীদের সঙ্গে এদের সংঘাত বাড়ছে। যার প্রতিফলন দেখা যাচ্ছে বিভিন্ন নির্বাচনে। দলের অনেক সংসদ সদস্য জনগণকে পশ্চাৎপদ চেতনায় ফিরিয়ে নিতে সক্রিয় আজ। প্রশাসনেরও এর প্রভাব রয়েছে। আওয়ামী লীগও এর আগে প্রত্যক্ষ যেসব সংগঠন রয়েছে এবং যারা নেতৃত্বে আসীন, সাধারণ জনগণের কাছে তাদের ভাবমূর্তি কোন উচ্চাসন পায় না। এদের আচার-আচরণ, হাবভাব, জ্ঞান-গরিমা, শিক্ষা-দীক্ষার মান এমন স্তরে যে, জনগণ মনেই করে না এরা জননেতা। ক্ষমতাসীন দল আওয়ামী লীগ সরকারের মধ্যে এমনভাবে আবদ্ধ হয়ে পড়েছে যে, দলটাকে আলাদা করে চিহ্নিত করা যায় না। মন্ত্রী আর দলনেতা একই জন হওয়ার সুবাদে তাদের গ্রহণযোগ্যতা নানা প্রশ্নবাণে বিদ্ধ। চলতি বছরের ডিসেম্বরে একাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন। এই নির্বাচনে আওয়ামী লীগ তার গত চার বছরের উন্নয়ন কর্মকা- নিয়ে জনগণের কাছে হাজির হবে। কিন্তু এতে চিড়ে ভিজবে কিনা সে নিয়ে সন্দেহ রয়েছে। কারণ স্থানীয় পর্যায়ে আওয়ামী লীগ ও এর অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ সংগঠনের নেতাদের কর্মকা- বিশ্লেষণ করেই জনগণ ভোট দেবে। প্রত্যন্ত অঞ্চলে দলটির অবস্থা এমন যে, একই আসনে অন্যান্য প্রার্থীর সমাহার ঘটছে। নব্য ধনী, নব্য লুটেরা, দুর্নীতিতে অর্থবিত্ত সম্পদের মালিক হয়েছে যারা, তারা মনোনয়ন পাওয়ার জন্য হেন কাজ নেই, যা থেকে বিরত থাকবেন। দলের মনোনীত প্রার্থীর বিরুদ্ধে দলের বিদ্রোহী প্রার্থীর সংখ্যা এবার বাড়বে। যার নিদর্শন তৃণমূল পর্যায়ে দেখা গেছে। আর এ নিয়ে স্থানীয় পর্যায়ে দলের নেতা-কর্মীরা যেভাবে দ্বিধাবিভক্ত হয়েছে। তাদের মধ্যে ঐক্য স্থাপন করা যায়নি। ফলে সর্বত্র এখন দলের বিরুদ্ধে দল, নেতার বিরুদ্ধে নেতা, কর্মীর বিরুদ্ধে কর্মীর বিকাশ ও বিস্তার ঘটেছে।

একদা অতিকায় ডাইনোসোরে পরিণত হওয়া বিএনপি এখন অবলুপ্তির পথে। নির্বাচনে প্রার্থী হবার মতো লোকেরও অভাব। অবস্থা দলটির এমন যে, আওয়ামী লীগের প্রার্থীর সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতায় অবতীর্ণ হবার মতো অবস্থাও আর নেই। তাই এবারের নির্বাচনে আওামী লীগের প্রধান প্রতিদ্বন্দ্বী হবে আওয়ামী লীগ। সর্বত্র এখন একাধিক প্রার্থী প্রচারে নেমেছে। এই প্রার্থীদের পক্ষে বিপক্ষে অবস্থান নিচ্ছে দলের নেতা-কর্মীরা। অনেকস্থানে হাঙ্গামাও হচ্ছে। দল যেহেতু নিয়ন্ত্রণহীন সেহেতু স্থানীয় পর্যায়ে দলকে ঐক্যবদ্ধ রাখা অসম্ভব প্রায় এখন। নির্বাচনের আগে দলটি ঐক্যবদ্ধ অবস্থানে রাখার জন্য কোন পদক্ষেপ দৃশ্যমান নয়। জনগণ চায় না আওয়ামী নামক দলটি বিপর্যয়ের দিকে ধাবিত হোক। লৌকিকভাবে কিছু না হলে অলৌকিকভাবে দলটি নিজস্ব অস্তিত্ব রক্ষা করতে পারবে এমন অবস্থাও চোখে পড়ছে না।

আমাদের ভাষা গণমানুষের
মানবকণ্ঠ
www.manobkantha.com

ঠেকানোই গেল না রোহিঙ্গা ভোটার

জাহাঙ্গীর কিরণ :
রোহিঙ্গা অধ্যুষিত এলাকাগুলো চিহ্নিতকরণ, বিশেষ অঞ্চল ঘোষণা করে বাড়তি নজরদারি এবং সার্বক্ষণিক মনিটরিং করতে বিশেষ কমিটি গঠন গ্রহণ করেও ভোটার তালিকায় রোহিঙ্গা ঠেকাতে পারল না নির্বাচন কমিশন (ইসি)। স্থানীয় জনপ্রতিনিধি ও ভোটার তালিকা হালনাগাদ কার্যক্রমে সম্পৃক্তরা টাকার বিনিময়ে তাদের বাংলাদেশি ভোটার বানিয়ে ফেলেছে। চূড়ান্ত ভোটার তালিকা প্রকাশ করার পর এখন ধীরে ধীরে অতিগোপনীয় এসব বিষয় ফাঁস হচ্ছে। সম্প্রতি রোহিঙ্গা অধ্যুষিত এলাকা কক্সবাজার সদর উপজেলার পূর্ব গোমাতলী সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক শামসুর রহমানের দুই রোহিঙ্গাকে অর্থের বিনিময়ে ভোটার তালিকায় নাম অন্তর্ভুক্ত করার বিষয়টি সামনে চলে আসলে নড়ে চড়ে বসে কমিশন। সংশ্লিষ্টদের বিরুদ্ধে বিভাগীয় ব্যবস্থা নেয়ার তাগিদ দেয়াসহ ফৌজদারি মামলা চালানোর সিদ্ধান্ত নেয়া হয়েছে।
গত বছরের ২৫ আগস্ট মিয়ানমার জান্তা সরকারের অমানবিক নির্যাতনে প্রাণভয়ে বাংলাদেশে পালিয়ে আসে লাখ লাখ রোহিঙ্গা। মানবিক কারণে তাদের আশ্রয় দেয় বর্তমান সরকার। বিশ্বের বিভিন্ন সংস্থা রোহিঙ্গাদের ওপর নিধনযজ্ঞকে ‘গণহত্যা’ হিসেবে আখ্যায়িত করেছে। এখন পর্যন্ত রোহিঙ্গাদের ওপর নির্যাতন থামেনি; সীমান্ত পেরিয়ে এখানে আশ্রয় নিতে আসছে। এ অবস্থায় রোহিঙ্গারা বাংলাদেশি নাগরিক সাজার প্রাণান্তর চেষ্টা চালাচ্ছে। আর তাতে সহযোগিতা করছে এদেশীয় কিছু দুর্নীতিবাজ।
ইসির কর্মকর্তারা বলেন, অর্থের বিনিময়ে স্থানীয় জনপ্রতিনিধিরা ভুয়া সনদ প্রদান করছে এমন গুরুতর অভিযোগ ওঠে। যার পরিপ্রেক্ষিতে রোহিঙ্গাদের ভোটার হওয়া ঠেকাতে নির্বাচন কমিশন শুরুতে নানা পদক্ষেপ নেয়। পরে জনপ্রতিনিধিদের এ অনৈতিক কাজ থেকে নিবৃত রাখতে তাদের বিরুদ্ধে মামলা করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। পাশাপাশি নির্বাচন কমিশন স্থানীয় সরকার বিভাগকে চিঠি দিয়ে জনপ্রতিনিধিদের আরো সচেতন হওয়ার অনুরোধ জানায়।
এর আগে রোহিঙ্গাদের ভোটার হওয়া ঠেকাতে চট্টগ্রাম ও আশপাশের চার জেলার ৩০টি উপজেলাকে বিশেষ এলাকা ঘোষণা করে ইসি। ওই সব এলাকায় ভোটার তালিকাভুক্তি যাচাই-বাছাইয়ে বিশেষ কমিটিও গঠন করা হয়েছে। এমনকি ভোটার হওয়ার ক্ষেত্রে বাবা-মা ছাড়াও আত্মীয়স্বজনদের এনআইডি কার্ডের ফটোকপি জমা দেয়ার নির্দেশনা জারি করা হয়। পরে রোহিঙ্গাদের ভোটার হওয়ার চেষ্টার তথ্য পাওয়ার পর বিশেষ এলাকার সংখ্যা বাড়িয়ে ৩২টি উপজেলা করা হয়। রোহিঙ্গাদের ঠেকাতে বিশেষ কমিটির কার্যক্রম চালানো হয়। কিন্তু কমিশনের এত সর্তকমূলক ব্যবস্থার পরও জনপ্রতিনিধিদের পাশাপাশি অর্থের প্রলোভনে ভোটার তালিকার সঙ্গে যুক্ত স্কুলের শিক্ষক-শিক্ষীকারা অনৈতিক কাজে জড়িয়ে পড়ে।
সর্বশেষ রোহিঙ্গা অধ্যুষিত এলাকা কক্সবাজার সদর উপজেলার পূর্ব গোমাতলী সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক শামসুর রহমান দুই রোহিঙ্গাকে অর্থের বিনিময়ে ভোটার তালিকায় নাম অন্তর্ভুক্ত করেন। কমিশনের তদন্তে অভিযোগের সত্যতা প্রমাণিত হয়। পরে ওই শিক্ষকের বিরুদ্ধে অপরাধের শাস্তি স্বরুপ মামলার সিদ্ধান্ত নিতে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়ে চিঠি দিলে ফিরতি চিঠিতে কমিশনের সঙ্গে একমত হয় তারাও। মন্ত্রণালয়ের সিদ্ধান্তের পরিপ্রেক্ষিতে ভোটার তালিকা আইন, ২০০৯ এর ১৮ ধারা অনুযায়ী তার বিরুদ্ধে ফৌজদারি মামলা হচ্ছে।
জানা যায়, গত বছর হালনাগাদ ভোটার তালিকা কর্মসূচি চলাকালে এ কাজে যুক্ত করা হয় প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের অধীনস্থ বিভিন্ন শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানের শিক্ষক-শিক্ষীকাদের। ভোটার তালিকার কর্মযজ্ঞ দেশব্যাপী বিস্তৃত

হওয়ার কারণে কাজের সুবিধার্থে প্রাথমিক পর্যায়ের প্রতিষ্ঠানগুলোর শিক্ষক-শিক্ষীকাদের যুক্ত করে কমিশন। ইসির এক উপসচিব বলেন, অনিয়মের বিরুদ্ধে কমিশন কঠোর অবস্থান গ্রহণ করেছে। কোনো কর্মকর্তা কিংবা ব্যক্তির বিরুদ্ধে অনিয়মের অভিযোগ পেলে বিধি অনুযায়ী ব্যবস্থা নেয়া হচ্ছে। তিনি বলেন, রোহিঙ্গাদের ভোটার না করার বিষয়ে কমিশন নানামুখি পদক্ষেপ নেয়। কিন্তু ভোটার তালিকার সঙ্গে যুক্ত অনেকে অর্থের প্রলোভনে পড়ে অনৈতিক কাজে জড়িয়ে পড়েছেন। এরই ধারাবাহিকতায় শামসুর রহমান নামে এক প্রধান শিক্ষকের বিরুদ্ধে রোহিঙ্গাদের ভোটার করার সহযোগিতার প্রমাণ পাওয়া গেছে। তার বিরুদ্ধে ফৌজদারি মামলা করা হচ্ছে। এতে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি চাকরি থেকে বরখাস্ত হতে পারেন।

যায়যায়দিন

সীমানা পুনর্নির্ধারণে আইনি জটিলতা

যাযাদি রিপোর্ট

একাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনকে সামনে রেখে সংসদীয় আসনের সীমানা পুনর্নির্ধারণের উদ্যোগ নিয়েছে নির্বাচন কমিশন (ইসি)। কিন্তু সীমানা পুনর্নির্ধারণ করলে মামলা জটিলতায় পড়তে পারে পুরো নির্বাচন। সংস্থাটির জ্যেষ্ঠ কর্মকর্তারা জানিয়েছে, সীমানা পুনর্নির্ধারণ করতে হবে আদমশুমারির প্রতিবেদন প্রকাশের পর। কিন্তু এখনো সে প্রতিবেদন প্রকাশ পায়নি। বর্তমানে যে প্রতিবেদন রয়েছে সেটি প্রকাশ হয়েছে ২০১৪ সালের দশম সংসদ নির্বাচনেরও আগে। আর সে প্রতিবেদনের ভিত্তিতেই ২০১৩ সালের ফেব্রুয়ারিতে সীমানা পুনর্নির্ধারণ করেছিলেন কাজী রকিবউদ্দীন আহমদের নেতৃত্বাধীন কমিশন। যে কারণে একই আদমশুমারির প্রতিবেদনের পুনরায় সীমানা পুনর্নির্ধারণ হতে পারে না। কেন না, সে সময়ের চেয়ে জনসংখ্যা বেড়েছে অর্ধকোটির মতো।

সীমানা পুনর্নির্ধারণ আইনেও বলা হয়েছে, আদমশুমারির প্রতিবেদনের ভিত্তিতে ১০ বছর অন্তর অন্তর সংসদ নির্বাচনের আগে সংসদীয় আসনের সীমানা পুনর্নির্ধারণ করতে হবে।
ইসির যুগ্ম-সচিব পর্যায়ে কর্মকর্তারা বলছেন, বড় পরিসরে সব আসনের সীমানায় পরিবর্তন আনতে গেলে অনেক মামলা হয়ে যাবে। এ ক্ষেত্রে পুরো নির্বাচনী প্রক্রিয়া আইনি জটিলতায় পড়বে। কেন না, যারা বর্তমান সীমানাতে থাকতে চাইবেন, তারাই মামলা করবেন। অতীতেও এমন হয়েছে। এ ছাড়া সংবিধান অনুযায়ী নির্বাচন করতে হবে আগামী অক্টোবর থেকে ২০১৯ সালের জানুয়ারির মধ্যে। তাই সীমানা পুনর্নির্ধারণের জন্য প্রয়োজনীয় সময়ও হাতে নেই। এ কাজের সঙ্গে সম্পৃক্ত কর্মকর্তারা জানিয়েছেন, আদমশুমারির প্রতিবেদন প্রকাশ না হওয়া পর্যন্ত কোনোভাবেই সীমানা পুনর্নির্ধারণ করা উচিত হবে না। তবে কিছু অনিবার্য কারণে কোনো কোনো আসনের সীমানা পুনর্নির্ধারণ করা যেতে পারে।
অনেক এলাকায় নতুন ইউনিয়ন, গ্রাম, কোথাও পৌরসভা সৃষ্টি হয়েছে। আবার বিলুপ্ত ছিটমহলগুলোও অনেক ইউনিয়নের সঙ্গে যুক্ত হয়েছে। এ ছাড়া নদী ভাঙনজনিত কারণেও কিছু কিছু আসনের সীমানা পরিবর্তন হয়েছে। কেবল এমন আসনগুলোর সীমানাই পুনর্বিন্যাসযোগ্য বলে মনে করা হচ্ছে।
সম্প্রতি অবসরে যাওয়া ইসির উপ-সচিব মিহির সারওয়ার মোর্শেদ বলেন, অতীতের অভিজ্ঞতা থেকে যেটা দেখতে পান, তা হলো বর্তমান পরিস্থিতিতে সীমানা পুনর্নির্ধারণ করা হলে অনেক মামলা হবে। কেন না, আদমশুমারি না হওয়ায় ইসির শক্ত কোনো ভিত্তি নেই। তাই বড় পরিসরে সীমানা পুনর্নির্ধারণ করা সঠিক সিদ্ধান্ত হবে না। এ কর্মকর্তা তার সময়ে নির্বাচন পরিচালনার সঙ্গেই বেশি সম্পৃক্ত ছিলেন। ইতোমধ্যে বিএনপিসহ বেশকিছু দল ২০০১ সালের সীমানায় ফিরে যেতে ইসির কাছে দাবি জানিয়েছে। অন্যদিকে আওয়ামী লীগ, গণমাধ্যম প্রতিনিধি, সুশীল সমাজের প্রতিনিধিরাও সংলাপে এসে সীমানা পুনর্নির্ধারণ না করার সুপারিশ করেছে।

The Daily Star

US wants to see inclusive elections

Says Trump aide Lisa Curtis

Diplomatic Correspondent

As the US put emphasis on a participatory general election, Dhaka yesterday assured Washington that the polls will be free, fair, and inclusive.

Deputy Assistant to the US President and Senior Director for South and Central Asia at the National Security Council Lisa Curtis raised the issue during her discussions with high government officials yesterday.

Following a query from Curtis, Foreign Minister AH Mahmood Ali said Bangladesh is committed to a free, fair and participatory election and that

observers from different countries, including the US, are welcome.

Terming Bangladesh an “important partner” of the Indo-Pacific strategy of the Trump administration, Curtis said Washington would stand by Bangladesh to resolve the Rohingya crisis and continue to press Myanmar to create conditions so that the Rohingyas could return home with safety and security.

According to a foreign ministry press release, the ongoing Rohingya issue featured prominently in the meetings. Curtis shared her experience of Cox's Bazar where she talked to the refugees.

She deeply appreciated Bangladesh's role in sheltering the persecuted Rohingyas and providing them with necessary support. She said Bangladesh could be a model in the world on how to deal with such humanitarian situations.

Curtis also offered further US assistance to deal with the challenges ahead, especially during the upcoming monsoon.

Foreign Minister Ali thanked the US for strong political and humanitarian support for Bangladesh in addressing the crisis. He urged the US to continue playing a strong role at the UN Security Council.

Ali also stressed the need for sustained pressure of the international community, including the US, on the Myanmar government to create a safe and secure condition in Rakhine State for the safe and sustainable repatriation of the Rohingyas.

Curtis assured that Rohingya issue was now a part of the US policy discussion and it would continue with the pressure on Myanmar.

On the repatriation of the killers of Father of the Nation Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman, Curtis said she would convey the message to the high dignitaries in Washington.

The top official of the US administration, who warped her three-day visit yesterday, also held a meeting with Prime Minister's Security Affairs Adviser Maj Gen (retd) Tarique Ahmed Siddique and discussed the prospect of strengthening bilateral cooperation in the areas of defence and security.

Curtis also called on PM's International Affairs Adviser Gowher Rizvi prior to departing yesterday evening.

MEETING WITH BNP

The BNP yesterday briefed Curtis on the political situation in Bangladesh, BNP Chairperson Khaleda Zia's conviction, and the upcoming parliamentary elections, reports our staff correspondent.

A BNP delegation, led by its Secretary General Mirza Fakhrul Islam Alamgir, met Curtis at US Ambassador to Bangladesh Marcia Bernicat's residence in the afternoon.

“We had a closed-door meeting. We discussed the overall situation of the country,” Amir Khasru Mahmud Chowdhury, a standing committee member of the party, told The Daily Star.

He, however, refused to say anything in details. The BNP also did not formally say anything about the meeting.

Meeting sources said the BNP leaders told Curtis that the government was dillydallying on matters regarding the bail of Khaleda and that the government wants to hold a one-sided election keeping the BNP out.

In response, Curtis told the BNP team that the US wants an inclusive election with the participation of all political parties, said a BNP leader wishing not to be named.